১

প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচার ও পোল্যান্ডের বিভাজন

আঠার শতকে ইউরোপে ব্যাপক জ্ঞানদীপ্তি বা মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হয়। এজন্যে আঠার শতক জ্ঞানদীপ্তির যুগ (Age of Enlightenment) বলে পরিচিত। জ্ঞানদীপ্তির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে সব বিষয়ে যুক্তিবাদের প্রাধান্য মেনে নেয়া। এ সময়ের দার্শনিকেরা মত প্রকাশ করেন যে, সকল কিছুর পেছনে নিয়ম বা যুক্তি কাজ করে। প্রকৃতি নিজেই নিয়ম বা Law মেনে চলে। অতএব মানব সমাজ ও রাষ্ট্র যেহেতু প্রকৃতির অধীন সেজন্যে এগুলোও নিয়ম বা Law মেনে চলতে বাধ্য।

এসব দার্শনিকের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ভলতেয়ার, মতেসকিয়োঁ, দেনিশ দিদেরো, ডি এলেমবার্ট, জন লক। তাঁরা সাধারণভাবে এমত প্রকাশ করেন যে, রাষ্ট্র মানব সমাজের মঙ্গলের জন্যে গঠিত হয়েছে। অতএব, রাষ্ট্রের শাসকের (অর্থাৎ রাজার) যেমন অধিকার আছে তেমনি তাঁর কতোগুলো কর্তব্যও রয়েছে। কর্তব্য পালন না করে অধিকার ভোগ করা প্রাকৃতিক নিয়মের পরিপন্থী। সতেরো শতকে ইউরোপের রাজশক্তি স্বর্গীয় অধিকার দাবি করে শাসন করতো। যেহেতু তাঁরা ঈশ্বর বা ভগবান কর্তৃক প্রেরিত, তাই তাঁরা পৃথিবীর কোনো শক্তির নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে রাজশক্তি প্রজাদের মঙ্গল সাধনে সচেষ্ট হন নি। কিন্তু উল্লেখিত দার্শনিকেরা এ ধারণার বিরোধিতা করেন। তাঁদের মতে ঈশ্বর রাজাদের যেমন অধিকার দিয়েছেন তেমনি কর্তব্যও নির্দেশ করেছেন।

দার্শনিকদের ভাবধারা অনুযায়ী ইউরোপের কয়েকটি দেশের রাজা তাদের প্রজাদের কল্যাণের জন্যে কতগুলো সংস্কার প্রবর্তন করেন, কিন্তু তাঁদের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা যাতে খর্ব না করা হয় সেদিকেও তাঁরা লক্ষ্য রাখেন। অর্থাৎ তাঁরা নিজেদের স্বৈরতন্ত্রী ক্ষমতা অক্ষুন্ন রেখে প্রজাদের মঙ্গল সাধনে সচেষ্ট হন। এরূপ শাসন প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচার (Benevolent Despotism) বা জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার (Enlightened Despotism) নামে পরিচিত। এসব শাসকের মধ্যে ছিলেন প্রুশিয়ার মহামতি ফ্রেডারিখ, অস্ট্রিয়ার দ্বিতীয় জোসেফ, রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথারিন, পর্তুগালের প্রথম জোসেফ, সুইডেনের তৃতীয় গাস্ট্রার্ভাস এবং টাস্কানির লিওপোল্ড। কিন্তু জ্ঞানদীপ্ত হলেও এসব শাসকের মধ্যে অনেকেই পররাজ্য গ্রাস করে নিজেদের বংশের এবং রাজ্যের মর্যাদা বৃদ্ধিতে সদা সচেষ্ট ছিলেন।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে-

- *পাঠ-১: দ্বিতীয় ক্যাথারিন;*
- *পাঠ-২: মহামতি ফ্রেডারিখ;*
- *পাঠ-৩: দ্বিতীয় যোসেফ;*
- *পাঠ-৪: পোল্যান্ডের বিভাজন;*

পাঠ - ১

দ্বিতীয় ক্যাথারিন

এই পাঠ শেষে আপনি–

- দ্বিতীয় ক্যাথারিনের অভ্যন্তরীণ সংস্কার সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- দ্বিতীয় ক্যাথারিনের পররাষ্ট্রনীতি আলোচনা করতে পারবেন।

দ্বিতীয় ক্যাথারিন বা মহামতি ক্যাথারিন ১৭২৯ সালে জার্মানির একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রোটেস্টান্ট পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল সোফিয়া অগাষ্টা ফ্রেডারিখ অর্থাৎ সংক্ষেপে সোফিয়া। প্রুশিয়ার মহামতি ফ্রেডারিখের উদ্যোগে রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের ভাগ্নে পিটারের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। এলিজাবেথ নিঃসন্তান ছিলেন বলে তিনি পিটারকে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন। রাশিয়ায় এসেই তিনি ঐ দেশের ভাষা আয়ত্ত্ব করেন, স্থানীয় ধর্ম (Greek Orthodox Church) গ্রহণ করেন, স্থানীয়দেরকে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেন এবং একজন বুদ্ধিমতি ও দেশপ্রেমিক মহিলা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। নতুন ধর্মমত গ্রহণকালে তিনি ইক্যাতেরিনা আলেক্সিয়েভনা নামধারণ করেন।

ক্যাথারিনের ক্ষমতালাভ

১৭৬১ সালে সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের মৃত্যুর পর তৃতীয় পিটার সিংহাসনে বসেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই রাশিয়ার জনগণ শাসক হিসেবে তাঁর অযোগ্যতার পরিচয় পায়। বিশেষত গির্জা ও সেনাবাহিনী প্রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও ক্ষমতায় এসেই পিটার প্রুশিয়ায় অধিকৃত অঞ্চল এবং ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার পক্ষ ত্যাগ করেন এবং প্রুশিয়ার পক্ষ সমর্থন করেন। এমন কি তিনি রাশিয়াকে প্রুশিয়ার একটি আশ্রিত রাজ্য হিসেবে ঘোষণা দেয়ার পরিকল্পনা করেন। এভাবে তৃতীয় পিটার যখন তাঁর জনপ্রিয়তা হারাচ্ছিলেন ক্যাথারিনের জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। দুজনের মধ্যে সম্পর্কে তিক্ততা সৃষ্টি হয় এবং এক পর্যায়ে পিটার বিবাহ বিচ্ছেদের কথা ভাবতে থাকেন। এদিকে ক্যাথারিন তাঁর জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে ক্ষমতা দখলের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ অবস্থায় ১৭৬২ সালের ২৮ জুন তারিখে একটি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পিটার ক্ষমতা থেকে অপসারিত হন এবং ক্যাথারিন আলেক্সিয়েভনা দ্বিতীয় ক্যাথারিন নাম ধারণ করে রাশিয়ার সিংহাসনে উপবিষ্ট হন।

দার্শনিকদের সঙ্গে যোগাযোগ

বিয়ের পর থেকেই ক্যাথারিন ভলতেয়ার, মতেসকিয়োঁ ও বিশ্বকোষ রচনাকারীদের লেখাগুলো পড়তে থাকেন এবং তাদের চিন্তা-চেতনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। প্রকৃতপক্ষে সম্রাজ্ঞী হওয়ার পর তিনি ফরাসি দার্শনিকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং তাঁর পরিকল্পিত

সংস্কারগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেন। ভলতেয়ারের সঙ্গে তিনি দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে পত্রালাপ অব্যাহত রেখেছিলেন। ক্যাথারিন তাঁকে মস্কোতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি এ আমন্ত্রণে সাড়া দেন নি। অবশ্য দিদেরো তাঁর আমন্ত্রণে মস্কো এসেছিলেন।

দিদেরোর যখন অর্থাভাব দেখা দেয় তখন তিনি তাকে সাহায্যের লক্ষ্যে তাঁর গ্রন্থাগার ক্রয় করেন। শর্ত থাকে যে, তিনি যতোদিন জীবিত থাকবেন ততোদিন এর রক্ষণাবেক্ষণ করবেন এবং গ্রন্থাগারিক হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্যে সম্মানিও পাবেন। বিশ্বকোষ প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি এর অন্যতম রচয়িতা ডি এলেবার্টকে তাঁর নাতি-নাতনীদের গৃহ শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর এ প্রস্তাবে সম্মতি দেন নি।

অভ্যন্তরীণ সংস্কার

দ্বিতীয় ক্যাথারিন স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন। কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন "জ্ঞানদীপ্ত" (Enlightened) বা প্রজাহিতৈষী শাসক হিসেবে পরিচিত হতে। এ লক্ষ্যে তিনি কিছু উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন। ১৭৬৭ সালে তিনি আইন, বিচার ও শাসন ব্যবস্থায় সংস্কার প্রবর্তনের এবং কৃষক সম্প্রদায়ের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যে ৬৫০ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করেন। কমিশনকে মতেসকিয়োঁর Spirit of Law গ্রন্থের ভিত্তিতে কতগুলো নির্দেশ (Instructions) দেয়া হয় এবং এগুলোকে জার্মান, ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করে ইউরোপের সর্বত্র পাঠানো হয়। এতে সর্বত্র প্রগতিবাদীরা বিস্মিত এবং রক্ষণশীল গোষ্ঠী আহত হয়। কিন্তু স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন ছাড়া এ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো সংস্কার প্রবর্তন করা হয় নি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে জনগণের অনগ্রসরতা এবং রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতির কারণে শুধু স্বৈরতন্ত্রী সরকার ব্যবস্থাই রাশিয়ায় কার্যকর হতে পারে। অতএব প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণার প্রতি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর আস্থা থাকলেও কার্যত তিনি স্বৈরতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। দিদেরো এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, "দার্শনিকরা ভাগ্যবান। আপনারা লেখেন প্রাণহীন কাগজে, আর আমাদেরকে লিখতে হয় মানুষের স্পর্শকাতর চামড়ায়।" অর্থাৎ তত্ত্বগতভাবে যা বলা যায় বাস্তবে সব সময় তা করা যায় না।

কৃষকদের শোচনীয় অবস্থা

কৃষকরা ছিল দেশের জনগোষ্ঠীর শতকরা ৯৫ ভাগ এবং এদের অর্ধেক ছিল ভূমিদাস। অথচ ক্যাথারিন তাদের মঙ্গলের জন্যে কোনো ব্যবস্থা নেন নি। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর শাসন আমলে কৃষকদের অবস্থার অবনতি ঘটে। কেননা যেসব ক্ষেত্রে ভূমিদাস বেগার খাটুনির পরিবর্তে অর্থের মাধ্যমে সামন্তপ্রভুদের প্রতি তাদের দায় পরিশোধ করতো সেখানে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বিগুণ করা হয়। অপরপক্ষে বেগার খাটুনির মাত্রা বাড়িয়ে দেয়া হয়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, ভূমিদাস প্রথা কৃষিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মহামতি পিটারের শাসন আমল থেকে যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল সেগুলোর কোনো কোনোটিতে ভূমিদাসদেরকে কাজ করতে হতো। এ অবস্থার কারণে ক্যাথারিনের রাজত্বকালে কয়েকটি কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল ১৭৭৩ সালের কৃষক বিদ্রোহ। ক্যাথারিন নির্মমভাবে এ

বিদ্রোহ দমন করেন। হাজার হাজার কৃষককে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়, মহিলা ও শিশুসহ কয়েক হাজার কৃষককে সাইবেরিয়াতে নির্বাসনে পাঠানো হয়। ভবিষ্যতে যাতে কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত না হয় তার জন্যে ক্যাথারিন সরকার ও ভূস্বামীদের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন।

শিল্পোন্নয়ন

রাশিয়ার অর্থনীতি মূলত কৃষি ভিত্তিক হলেও এ সময়ে শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ব্যবস্থা গৃহীত হয়। রাশিয়ার বিভিন্ন এলাকায় অনেকগুলো ফ্যাক্টরি গড়ে ওঠে এবং এগুলোর কোনো কোনোটিতে শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়ায় এক হাজারে। এসব ফ্যাক্টরিতে যুদ্ধাস্ত্র, সামরিক ও নৌ-বাহিনীর সদস্যদের ব্যবহারের জন্যে জুতা ও বস্ত্র তৈরি করা হতো। ক্যাথারিনের শাসন আমলে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যও সম্প্রসারিত হয় এবং আমদানি-রপ্তানি পণ্যের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। আমদানি পণ্যের মধ্যে ছিল ধনীদের ব্যবহারের পণ্য, উন্নতমানের বস্ত্র, আসবাবপত্র ইত্যাদি। যেসব পণ্য রপ্তানি করা হতো সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল কাঠ, লোহা, ফ্ল্যাক্স, মোম, ভাং ইত্যাদি।

পাশ্চাত্য সভ্যতার বিকাশ

দ্বিতীয় ক্যাথারিন নিজে পাশ্চাত্য দেশীয় ছিলেন। অতএব পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি স্বভাবতই তাঁর একটা আকর্ষণ ছিল। তিনি চেয়েছিলেন রাশিয়ায় পাশ্চাত্য সভ্যতা বিকাশ লাভ করুক। এদিক বিবেচনা করলে তাঁকে নিঃসন্দেহে মহামতি পিটারের যোগ্য উত্তরসূরী বলা যায়। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা বলতে তিনি বুঝাতেন ফরাসি সভ্যতা। তাঁর উদ্যোগে রাশিয়ার উচ্চ মহলে ফরাসি ভাষা, সাহিত্য, পোষাক এবং আচার-ব্যবহারের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। অনেক সামন্তপ্রভু ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের জন্যে ফরাসি দেশীয় শিক্ষক নিয়োগ করেন এবং অনেকে সন্তানদের উচ্চ শিক্ষার জন্যে ফরাসি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান। এর পাশাপাশি তিনি দেশে সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের জন্যেও কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি স্ত্রী শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ১৭৬৪ সালে Society For the Training of the Daughters of the Nobility প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া তিনি অস্ট্রিয়ার অনুকরণে মস্কো ও সেন্ট পিটারসবুর্গে নর্মাল স্কুল (শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য স্কুল) প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হলেও রুশো যে ধরনের জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রমের কথা ভেবেছিলেন ক্যাথারিনের শাসন আমলে সে ধরনের কোনো ব্যবস্থা গৃহীত হয় নি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, ক্যাথারিন যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন রাশিয়ায় দুই কোটি ৬০ লক্ষ অধিবাসীর জন্যে স্কুলের সংখ্যা ছিল মাত্র তিনশত।

বৈদেশিক নীতি

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ক্যাথারিনের অর্জন অনেক বেশি। এক্ষেত্রে তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল যতটা সম্ভব রাশিয়ার সীমানা সম্প্রসারিত করা এবং এ লক্ষ্য অর্জনে তিনি বিরাট সাফল্য লাভ করেছিলেন। তাঁর শাসন আমলে রাশিয়ার সীমান্ত কাস্পিয়ান, বাল্টিক ও কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। জার ইভানভের পরে আর কোনো শাসকের আমলে রাশিয়ার রাজ্যসীমা এতটা সম্প্রসারিত হয় নি। অর্থাৎ 'জ্ঞানদীপ্তস্ব ফ্রেডারিখের ন্যায় ক্যাথারিনও ছিলেন পররাজ্য লোভী এবং এ লোভ চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে তিনি ন্যায়-নীতির প্রতি কোনো শ্রদ্ধা দেখান নি।

পোল্যান্ডের ব্যবচ্ছেদে অংশগ্রহণ

দ্বিতীয় ক্যাথারিন প্রথম দৃষ্টি দেন পোল্যান্ডের প্রতি এবং প্রুশিয়ার মহামতি ফ্রেডারিখ ও অস্ট্রিয়ার সম্রাজ্ঞী মারিয়া থেরেসার সঙ্গে পোল্যান্ডের প্রথম বিভাজনে অংশ নেন। মহামতি ফ্রেডারিখ উল্লেখ করেছেন যে, পোল্যান্ডের ব্যবচ্ছেদের প্রশ্ন যখন আলোচিত হয় তখন ক্যাথারিনের প্রতি সহানুভূতির নিদর্শন স্বরূপ চোখের পানি ফেলেন। কিন্তু তিনি যতবেশি চোখের পানি ফেলেন পোল্যান্ডের ততোবেশি অংশ দাবি করেন। পোল্যান্ডের প্রথম ব্যবচ্ছেদ থেকে স্পেন, রাশিয়া ও অন্যান্য অঞ্চল রাশিয়ার দখলে আসে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, এসব অঞ্চল মধ্যযুগে রাশিয়ার দখলে ছিল এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল রাশিয়ান। পোল্যান্ডের দ্বিতীয় ব্যবচ্ছেদ ঘটে ১৭৯৩ সালে। এতে অংশ নেন ক্যাথারিন ও প্রুশিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেডারিখ উইলিয়াম। এর ফলে ত্রিশ লক্ষ জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত পোল্যান্ডের বিস্তীর্ণ অঞ্চল (বেলোরাশিয়া ও লিথুয়ানিয়ার অংশ বিশেষ এবং ইউক্রেন) রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়। পোল্যান্ডের তৃতীয় এবং শেষ ব্যবচ্ছেদ ঘটে ১৭৯৫ সালে রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও প্রুশিয়ার মধ্যে। এর ফলে রাশিয়া কোরল্যান্ড ও লুথিয়ানিয়াব অবশিষ্টাংশ লাভ করে। এভাবে পোল্যান্ডের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

ইতিপূর্বে মহামতি পিটার রাশিয়াকে 'পাশ্চাত্যকরণম্ব নীতির অংশ হিসেবে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অধীনস্থ আজভ শহর দখল করে কৃষ্ণ সাগরের সঙ্গে তাঁর রাজ্যের সংযোগ স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু ১৭১১ সালে পুনরায় আজভ শহর রাশিয়ার হস্তগত হয়েছিল। ক্ষমতায় এসেই দ্বিতীয় ক্যাথারিন আজভ দখলের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ফলে ১৭৬৮ সালে (অর্থাৎ পোল্যান্ডের প্রথম বিভাজনের আগেই) রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় এবং এ যুদ্ধ ছয় বছরকাল স্থায়ী হয়। যুদ্ধে তুরস্ক পরাজিত হয় এবং রাশিয়া ক্রমে ক্রমে আজভ, মোলদাভিয়া, ওয়ালেচিয়া ও বুখারেস্ট দখল করে নেয়। অত:পর ১৭৭৪ সালে কুচুক কাইনা রজীবত স্বাক্ষরিত চুক্তির ভিত্তিতে এ যুদ্ধের অবসান ঘটে। এ চুক্তির বলে 'ইউরোপের রুগ্ন ব্যক্তিম্ব নামে পরিচিত তুরস্ক ওয়ালেচিয়া ও মলদাভিয়া ফেরৎ পায়, তবে আজভ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ফলে কৃষ্ণ সাগরের সঙ্গে আবার সরাসরি রাশিয়ার যোগাযোগ স্থাপিত হয়। রাশিয়ার বাণিজ্য তরীগুলো এবার বসফরাস ও দার্দানেলিস প্রণালী দিয়ে ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করে এবং পশ্চিমা দেশ সমূহের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার লাভ করে। দ্বিতীয়ত, অতপর তুরস্ক সাম্রাজ্যের গ্রিক অর্থডক্স গির্জার অনুসারী প্রজারা রাশিয়াকে তাদের বন্ধু কিংবা মিত্র হিসেবে দেখতে থাকে। তৃতীয়ত, রাশিয়াকে কনসটান্টিনোপলের কিছু গির্জার রক্ষাকর্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার ফলে রাশিয়া তুর্কি সাম্রাজ্যের সকল খ্রিস্টান প্রজাদের রক্ষাকর্তা হিসেবে ঘোষণা দেয়ার এবং এ দাবির ভিত্তিতে তুরস্কের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অজুহাত পায়।

কিন্তু এতেও দ্বিতীয় ক্যাথারিন সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। কেননা প্রকৃতপক্ষে তার লক্ষ্য ছিল কনসটান্টিনোপলকে রাজধানী করে এক নতুন বাইজাইনটাইন সাম্রাজ্য স্থাপন করা। এ লক্ষ্যে তিনি যৌথভাবে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। অত:পর তিনি ক্রিমিয়া দখল করে নেন এবং এভাবে আবার যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। এ যুদ্ধ পাঁচ বছরকাল স্থায়ী হয়েছিল। ১৭৯২ সালে জাসিতে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি বলে ক্রিমিয়া এবং ইতিপূর্বে ১৭৭৪ সালের চুক্তিতে রাশিয়া যেসব অঞ্চল অধিকার করেছিল তা রাশিয়ার অধীনে থাকবে বলে

নিশ্চয়তা দেয়া হলো। কিন্তু তুর্কিদেরকে ইউরোপ থেকে সম্পূর্ণ বিতাড়িত করার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।

ফরাসি বিপ্লবের বিরোধিতা

১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে বিপ্লব শুরু হলে প্রথম থেকেই দ্বিতীয় ক্যাথারিন এর বিরোধিতা করেন। কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন যে, এ বিপ্লব তাঁর শাসনের জন্যে বিরাট বিপর্যয় ডেকে আনবে। তাই তিনি যেসব ধ্যান-ধারণা বিপ্লবীদের অনুপ্রাণিত করেছিল সেগুলো যাতে রাশিয়ায় প্রবেশ করতে না পারে তার জন্যে সচেষ্ট হন। যেসব নাগরিক বিপ্লবের পক্ষ সমর্থন করেছিল তাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেন। দ্বিতীয় ক্যাথারিন ১৭৯৬ সালের ১৭ নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। তিনি নিজেকে যতটা 'জ্ঞানদীপ্তস্ব' বা 'প্রজাহিতৈষীস্ব' বলে ভাবতেন বাস্তবে তা ছিলেন না। কেননা তিনি অনেক সংস্কারের পরিকল্পনা করলেও তা বাস্তবায়িত হয় নি। জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অবলম্বন করেন। তবে একটি ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল বিরাট– তিনি রাশিয়াকে একটি বৃহৎ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করেন। তিনি যথার্থই বলেছিলেন, "আমি সাধারণ মেয়ে হিসেবে রাশিয়ায় এসেছিলাম, রাশিয়া আমাকে অনেক দিয়েছিল। কিন্তু আমি প্রতিদান স্বরূপ রাশিয়াকে দিয়েছি আজভ, ক্রিমিয়া এবং পোল্যান্ডের বিরাট অংশ।"

সারসংক্ষেপ

১৭৬২ সালে দ্বিতীয় ক্যাথারিন রাশিয়ার সিংহাসনে উপবিষ্ট হন এবং ১৭৯৬ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনি নিজে ছিলেন প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী শাসক এবং এ ধরনের শাসনের অন্যতম প্রবক্তা দার্শনিক ভলতেয়ারের সংগে দীর্ঘদিন যোগাযোগ রাখেন। তাঁর রাজত্বকালে শিল্পোন্নয়ন, শিক্ষা সম্প্রসারণ এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা বিকাশের জন্যে কতগুলো সংস্কার প্রবর্তিত হয়। কিন্তু বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ক্যাথারিনের অর্জন ছিল অনেক বেশি। তিনি পোল্যান্ডের তিনটি ব্যবচ্ছেদে অংশ গ্রহণ করেন এবং তুরস্কের বিরুদ্ধে সাফল্য জনকভাবে যুদ্ধ করেন। ফলে তাঁর শাসন আমলে রাশিয়ার সীমারেখা বৃদ্ধি পায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশ্বে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ কতো সালে মৃত্যুবরণ করেন?

(ক) ১৭৬০ (খ) ১৭৬১

(গ) ১৭৬২ (ঘ) ১৭৬৩

২। ভলতেয়ারের সংগে ক্যাথারিন কত বছর ধরে পত্রালাপ করেন?

(ক) ২১ (খ) ২০

(গ) ১৮ (ঘ) ১৭

৩। ক্যাথারিনের মৃত্যুকালে রাশিয়ায় স্কুলের সংখ্যা কত ছিল?

(ক) ৫০০ (খ) ৪০০

(গ) ৩০০ (ঘ) ২০০

৪। পোল্যান্ডের দ্বিতীয় ব্যবচ্ছেদে অংশ গ্রহণের ফলে কত লক্ষ জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চল রাশিয়ার সংগে যুক্ত হয়?

(ক) ত্রিশ লক্ষ (খ) পঁচিশ লক্ষ

(গ) বাইশ লক্ষ (ঘ) বিশ লক্ষ

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। দ্বিতীয় ক্যাথারিন রাশিয়ায় কি ভাবে ক্ষমতা লাভ করেন?

২। দ্বিতীয় ক্যাথারিনের রাজত্বকালে শিক্ষা বিস্তারের জন্যে কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১। দ্বিতীয় ক্যাথারিনের অভ্যন্তরীণ সংস্কারগুলি আলোচনা করুন।

২। ক্যাথারিনের বৈদেশিক নীতির বর্ণনা দিন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

১। (খ) ২। (ক) ৩। (গ) ৪। (ক)

সহায়ক গ্রন্থাবলী

1. Robert Ergang, Europe from Renaissance to Waterloo

2. C.G. H. Hayes, A Political and Cultural History of Europe
3. Geoffery, Bruun, The Enlightened Despots

পাঠ - ২

মহামতি ফ্রেডারিখ

এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্রুশিয়ার মহামতি ফ্রেডারিখের সংস্কারগুলো বর্ণনা করতে পারবেন;
- ফ্রেডারিখের বৈদেশিক নীতি আলোচনা করতে পারবেন।

ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে জার্মানি তিন শতেরও বেশি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এগুলোর মধ্যে অস্ট্রিয়া ও প্রুশিয়া ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী। এদুটো দেশ যথাক্রমে হ্যাপসবুর্গ ও হোহেনজোর্লান রাজবংশের শাসনাধীন ছিল। প্রুশিয়ার রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ফ্রেডারিখ দ্বিতীয় উইলিয়াম বা মহামতি ফ্রেডারিখ। তিনি তাঁর পিতা ফ্রেডারিখ প্রথম উইলিয়ামের মৃত্যুর পর ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে প্রুশিয়ার সিংহাসনে বসেন এবং দীর্ঘ ৪৬ বছর রাজকার্য পরিচালনা করেন।

মহামতি ফ্রেডারিখের বাল্যকাল

বাল্যকালে ফ্রেডারিখ শিল্প-সাহিত্য ও দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন। ফরাসি দেশীয় যে শিক্ষকের উপর তার পড়াশুনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তিনি রাজকুমারকে ফরাসি সাহিত্য ও দর্শনের অনুরাগী হতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। ভলতেয়ারের প্রতি ফ্রেডারিখের ভক্তি ছিল অপরিসীম। প্রকৃতপক্ষে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দ্বিতীয় ভলতেয়ারে পরিণত হওয়া। এলক্ষ্যে তিনি ফরাসি ভাষায় কবিতা রচনায় এবং অন্যান্য লেখায় হাত দেন। কিন্তু ফ্রেডারিখ প্রথম উইলিয়াম এগুলো মোটেই পছন্দ করতেন না। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর ছেলে সমরবিদ্যায় পারদর্শী হউক এবং শাসনকার্যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করুক। এলক্ষ্যে তিনি পুত্রকে সর্বদা উপদেশ দিতেন এবং কখনও কখনও তাঁর হাত থেকে পুস্তক কেড়ে নিয়ে তা পুড়িয়ে ফেলতেন। প্রকাশ্যে তিনি পুত্রকে বেত্রাঘাত করতেও দ্বিধা করেন নি। পিতার অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে যুবক ফ্রেডারিখ সেনাবাহিনীতে কর্মরত কেটে নামক এক বন্ধুর সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু এ পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যায় এবং তাদের উভয়কে বন্দি করা হয়। একটি সামরিক আদালতে কেটের বিচার হয় এবং তাকে কারাদন্ড দেওয়া হয়। কিন্তু রাজা তার মৃত্যুদন্ডের আদেশ দেন। এ আদেশ কার্যকর করা হয় এমন জায়গায় যাতে ফ্রেডারিখ দ্বিতীয় উইলিয়াম ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করতে পারেন। অতপর তিনি পিতার প্রতিটি আদেশ মেনে চলবেন এরূপ প্রতিজ্ঞা করলে রাজকুমারকে মুক্তি দেওয়া হয়। প্রতিজ্ঞা মতো ফ্রেডারিখ দ্বিতীয় উইলিয়াম শাসনকার্যে অভিজ্ঞতা অর্জনের বিষয়ে যথার্থই উৎসাহী হন এবং পিতা-পুত্রের সম্পর্ক উন্নত হয়। মৃত্যুকালে ফ্রেডারিখ প্রথম উইলিয়াম বলতে পেরেছিলেন, “Oh God, I die

content, since I have so worthy a son and successor." (হে ঈশ্বর, আমার মৃত্যু স্বার্থক হচ্ছে যেহেতু আমার এমন একজন যোগ্য সন্তান ও উত্তারাধিকার রেখে যাচ্ছি যে আমার মত।)

প্রজাহিতৈষী শাসক

মহামতি ফ্রেডারিখ ছিলেন প্রজাহিতৈষী স্বৈরতন্ত্রী শাসকদের মধ্যে অন্যতম। প্রকৃতপক্ষে, এ ধরনের শাসনের অন্যতম প্রবক্তা ও তাঁর গুরু ভলতেয়ার কয়েক বছর ধরে ফ্রেডারিখের অতিথি ছিলেন। শেষ পর্যায়ে অবশ্য বিভিন্ন কারণে তাদের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠে এবং ভলতেয়ার পালিয়ে যান। ফ্রেডারিখ তাঁর শাসননীতি সম্পর্কে একাধিকবার ঘোষণা করেন "শাসকের জন্যে জনসাধারণ নয়, জনসাধারণের জন্যে শাসক। ভলতেয়ারকে তিনি বলেন, "আমার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে এদেশ থেকে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার দূর করা॥ জনগণকে যতটা সম্ভব সুখী করা।" বিশেষভাবে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পরবর্তীকালে তিনি এ লক্ষ্য অর্জনে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে তিনি সারাদিন শাসনকার্য পরিচালনায় ব্যাপৃত থাকতেন এবং সকল বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজ-খবর রাখতেন। তিনি এক বন্ধুকে লিখিত পত্রে বলেন, "তুমি সত্যই বলেছ যে, আমি কঠোর পরিশ্রম করি। প্রকৃতপক্ষে আমি বেঁচে থাকার জন্যেই পরিশ্রম করি। কেননা আলস্যের ন্যায় আর কিছুই মৃত্যুর সমকক্ষতা দাবি করতে পারে না।" এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি নিজে অপরিসীম পরিশ্রম করতেন এবং রাষ্ট্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে অনুরূপ পরিশ্রমী হতে বাধ্য করতেন।

শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি

শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্যে মহামতি ফ্রেডারিখ তাঁর পূর্বপুরুষদের অনুসৃত বণিকবাদ (Mercantilism) নীতি অবলম্বন করেন। তিনি বলেন, "শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে নীতি অনুসরণ করতে হবে তা হলো দেশ থেকে স্থায়ীভাবে যেন অর্থ (money) বিদেশে চলে না যায় তার জন্যে ব্যবস্থা করা।" আর এ লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে ইতিপূর্বে যেসব পণ্য আমদানি করা হতো তা দেশে উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এ লক্ষ্যে তিনি বিদেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্যের উপর অধিক হারে শুল্ক ধার্য করেন, নতুন শিল্প স্থাপনে সহায়তা করেন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। তবে তাঁর অনেত পরিকল্পনাই সফল হয় নি। উদাহরণস্বরূপ কফি আমদানির উপর উচ্চহারে শুল্ক ধার্যের কথা উল্লেখ করা যায়। এ সিদ্ধান্ত কফি সেবনকারীরা স্বভাবতই পছন্দ করে নি এবং ফলে চোরাপথে কফি আমদানি শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত মহামতি ফ্রেডারিখ এ শুল্ক প্রত্যাহার করেন। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে একথা অনস্বীকার্য যে, তাঁর শাসন আমলে প্রুশিয়া শিল্পে উন্নত হয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়।

কৃষি উন্নয়ন

মহামতি ফ্রেডারিখ কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সময় যেসব কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তিনি তাদের মধ্যে বিনামূল্যে শস্যবীজ ও জমি চাষের জন্যে গবাদি পশু বিতরণ করেন, তাদের ঘরবাড়ি মেরামতের ব্যবস্থা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের কর লাঘব করেন। তিনি ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকে লোকজনকে বসতি স্থাপনের জন্যে প্রুশিয়ায় আসার আমন্ত্রণ জানান এবং তাঁর আমন্ত্রণে প্রায় তিন লক্ষ বিদেশী সাড়া দেয়। ফলে দেশে আবাদী

জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তিনি সামন্তপ্রভু ও ভূ-স্বামীদেরকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ফসল ফলাতে উৎসাহিত করেন। কিন্তু 'জ্ঞানদীপ্তম্ব এবং 'প্রজাহিতৈষীম্ব বলে গর্ব করলেও ভূমিদাসদেরকে মুক্তি দেয়ার ব্যাপারে তিনি উৎসাহী ছিলেন না। এছাড়া দুই লক্ষ সদস্য বিশিষ্ট বিরাট সেনাবাহিনীর ভরণ-পোষণের জন্যে কৃষকদের উপর উচ্চ হারে কর ধার্য করেন। অবশ্য তিনি নিয়ম করেন যে, যেসব চাষী সরকারি জমি চাষ করতো তাদেরকে সপ্তাহে চার দিনের বেশি শ্রম দিতে হবে না।

বিচার বিভাগে সংস্কার ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে সহনশীলতা

মহামতি ফ্রেডারিখ বিচার বিভাগে অনেক সংস্কার প্রবর্তন করেন। বিশেষ কতগুলো ক্ষেত্র ব্যতীত তদন্তকার্যে নির্যাতনের ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করা হয়, অদক্ষ ও দুর্নীতি পরায়ণ বিচারকদেরকে বরখাস্ত করা হয়, সারাদেশে মামলার জন্যে একই হারে ফি ধার্য করা হয় এবং দ্রুত বিচারকার্য সম্পন্ন করার জন্যে ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এছাড়া জনগণের সুবিধার্থে দেশে প্রচলিত সকল আইনের সংকলন সহজ ভাষায় প্রকাশ করা হয়। মোটের পর মহামতি ফ্রেডারিখের শাসনকালে বিচার বিভাগ দক্ষতা ও সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে। ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ইউরোপের সবচেয়ে সহনশীল শাসক। তিনি ঘোষণা করেন, "আমার রাজ্যে সকল ধর্মকে সহ্য করা হবে এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ উপায়ে পরকালে মঙ্গলের পথ অনুসরণ করতে পারবে।" দীর্ঘ ৪৬ বছর রাজত্বকালে তিনি এ নীতি থেকে কখনও বিচ্যুত হন নি।

রোমের পোপ জেসুইট সংঘের সদস্যদেরকে নির্মূল করার জন্যে যে ঘোষণা জারি করেন ফ্রেডারিখ সে ঘোষণাকে প্রুশিয়ায় কার্যকর করতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে ফ্রান্স, পর্তুগাল এবং স্পেনের মত ক্যাথলিক রাষ্ট্র থেকে বহিষ্কৃত জেসুইটগণ প্রুশিয়ায় আশ্রয় নিতে পেরেছিল। তিনি ঘোষণা করেন, "যদি তুর্কিরা প্রুশিয়ায় বসতি স্থাপন করতে চায় আমি তাদেরকে মসজিদ তৈরি করে দেবো। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ ঘোষণায় সকল গোষ্ঠীর খ্রিস্টান বিস্মিত, এমনকি আহত হয়েছিল। তবে সকল ধর্মের মানুষকে স্বাধীনতা থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছিল। তাছাড়া কোন বিদেশী ইহুদী প্রুশিয়ায় বসতি স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করলে তার কাছ থেকে উচ্চ হারে অর্থ আদায় করা হতো। মহামতি ফ্রেডারিখের শাসন আমলে বাক-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন সংবাদপত্রকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত নয়। ধর্মের সমালোচনার ক্ষেত্রে সংবাদপত্র যতটা স্বাধীনতা ভোগ করতো অন্যান্য ক্ষেত্রে ততটা করতো না। 'জ্ঞানদীপ্তম্ব-এর প্রভাবে মহামতি ফ্রেডারিক ধর্ম সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। অতএব ধর্মের বিরূপ সমালোচনায় তাঁর আপত্তি ছিল না।

শিক্ষা সংস্কার

শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে ফ্রেডারিখ সজাগ ছিলেন। তিনি বলেন, "যুব সমাজের শিক্ষার গুরুত্ব সরকারকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। তিনি আরও বলেন, "মানুষের বয়স যতই বৃদ্ধি পায় ততই সে উপলব্ধি করে শিক্ষার গুরুত্বকে অবহেলা করলে কি ক্ষতি হয়।" কিন্তু এরূপ উপলব্ধি থাকলেও প্রাইমারি শিক্ষা প্রসারের জন্যে কিছু বিদ্যালয় স্থাপন ব্যতীত শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো সংস্কার প্রবর্তন করতে পারেন নি। এর প্রধান কারণ ছিল অর্থাভাব। বিরাট সেনাবাহিনীর ভরণ-পোষণের জন্যে ততোটা অর্থের প্রয়োজন হয়েছিল যে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষাক্ষেত্রে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল খুবই কম। উচ্চ শিক্ষা বিকাশের জন্যেও প্রয়োজন মতো অর্থের যোগান দেয়া সম্ভব হয় নি।

রাজ্য বিস্তার

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে বাল্যকাল থেকেই শিল্প-সাহিত্য, সঙ্গীত ও দর্শনের প্রতি দ্বিতীয় ফ্রেডারিখের উৎসাহ ছিল প্রচুর। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরেও তার এ উৎসাহ অব্যাহত ছিল। কিন্তু একই সঙ্গে তাঁর রাজ্যের সীমানা সম্প্রসারণে ছিল অসীম আগ্রহ। এজন্যে তিনি বিরাট সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন এবং দুটো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এ দুটো যুদ্ধ হচ্ছে অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ (১৭৪০-৪৮) ও সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ (১৭৫৬-৬৩)। এ দুটো যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল ইতোপূর্বে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। এ পাঠে এসব যুদ্ধে ফ্রেডারিখের ভূমিকা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ

প্রুশিয়ার হোহেনজোলার্ন বংশীয় শাসকবর্গ দীর্ঘদিন যাবত অস্ট্রিয়ার অধীন সাইলেশিয়া দাবি করে আসছিল। এবার ১৭৪০ সালে অস্ট্রিয়ার সম্রাট ষষ্ঠ চার্লসের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় ফ্রেডারিখ ঘোষণা করেন, "সব কিছুই প্রস্তুত রয়েছে, এবার শুধু দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পালা। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা না করেই সাইলেশিয়া আক্রমণ করেন। এভাবে শুরু হয় অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ। চার্লসের কন্যা মারিয়া থেরেসা যুদ্ধের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে অতি সহজেই প্রুশিয় বাহিনী জয়ী হয় এবং চৌদ্দ হাজার বর্গ মাইল আয়তন বিশিষ্ট সাইলেশিয়া দখল করে। ১৭৪২ সালে ফ্রেডারিখ এ যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ান। ১৭৪৮ সালে যে চুক্তির মাধ্যমে এ যুদ্ধের অবসান হয় তাতে প্রুশিয়া কর্তৃক সাইলেশিয়া দখলের ঘটনাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ

কিন্তু মারিয়া থেরেসা কোনো মতেই অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধে পরাজয় (বিশেষ করে সাইলেশিয়া হারানোর কথা) ভুলতে পারলেন না। ফলে সাইলেশিয়া ও অন্যান্য কয়েকটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আট বছর পর সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। এ যুদ্ধ একই সময়ে চলেছিল ইউরোপ, আমেরিকা ও ভারত উপমহাদেশে। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে একমাত্র ইংল্যান্ড প্রুশিয়ার পক্ষে ছিলেন। ফ্রেডারিখ কর্তৃক স্যাক্সনি দখল দিয়ে যুদ্ধের সূচনা হয়। অতপর তিনি বোহেমিয়া আক্রমণ করেন, কিন্তু দেশটি দখল করতে ব্যর্থ হন। পরের বছর (১৭৫৭ সাল) প্রুশিয়া চতুর্দিক থেকে রাশিয়া, সুইডেন, অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্স কর্তৃক আক্রান্ত হয়। দেশের এ দুর্দিনে ফ্রেডারিখ এমন সামরিক প্রতিভার পরিচয় দেন যার ফলে তিনি 'মহামতিম্ব উপাধিতে ভূষিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। তিনি অস্ট্রিয়া ও ফরাসি বাহিনীকে পরাজিত করেন, কিন্তু এতে তাঁর সেনাবাহিনী ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে রাশিয়া ১৭৫৯ সালে পূর্ব প্রুশিয়া ও বার্লিন দখল করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাশিয়ার সাহায্যেই ফ্রেডারিখ রক্ষা পান। ১৭৬২ সালে রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ মৃত্যুবরণ করেন এবং রাশিয়ার সিংহাসনে বসেন তৃতীয় পিটার। তিনি ছিলেন মহামতি ফ্রেডারিখের ভীষণ ভক্ত। তাই সিংহাসনে বসেই তিনি রাশিয়ার সেনাবাহিনীর সাহায্যে সেনাবাহিনীকে অধিকৃত অঞ্চলগুলো ছেড়ে দিয়ে ফ্রেডারিখ স্যাক্সনিতে তাঁর দখল অব্যাহত রাখতে সমর্থ হন। ১৭৬৩ সালে স্বাক্ষরিত প্যারিস চুক্তির মাধ্যমে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অবসান হয়। এ সন্ধির শর্তানুযায়ী ফ্রেডারিখ স্যাক্সনি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন, কিন্তু সাইলেশিয়া তাঁর দখলে থাকে।

মূল্যায়ন

মহামতি ফ্রেডারিখ ১৭৮৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি যখন সিংহাসনে আরোহন করেন তখন প্রুশিয়ার জনসংখ্যা ছিল বিশ লক্ষ। তাঁর মৃত্যুকালে প্রুশিয়া ছিল চল্লিশ লক্ষ লোকের আবাস ভূমি। এ থেকেই প্রমাণিত হয় তাঁর রাজত্বকালে প্রুশিয়ার আয়তন কতটা বৃদ্ধি পেয়েছিল। সামগ্রিক ভাবে জার্মানির স্বার্থের প্রশ্ন তাঁর চিন্তা চেতনায় প্রাধান্য পায় নি। জার্মান ভাষায় তিনি লেখেন নি, এ ভাষায় তিনি খুব একটা কথাও বলতেন না। হার্ডার, কান্ট, গ্যেটে প্রমুখ জার্মান লেখক সম্পর্কে তার কোনো উঁচু ধারণা ছিল না, তিনি ছিলেন ফরাসি ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও দর্শনের ভক্ত। তবুও তিনি জার্মান জনগণ এবং লেখকদের ভালোবাসা পেয়েছিলেন।

সারসংক্ষেপ

মহামতি দ্বিতীয় ফ্রেডারিখ ১৭৮০ সালে প্রুশিয়ার সিংহাসনে বসেন এবং দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে রাজকার্য পরিচালনা করেন। তিনি ছিলেন প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী শাসকদের অন্যতম। তাঁর রাজত্বকালে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি, শিক্ষা সম্প্রসারণ ও বিচার বিভাগের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে কতগুলো ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। একই সংগে তিনি ধর্মীয় সহনশীলতার নীতি অনুসরণ করেণ। কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী শাসকের ন্যায় ফ্রেডারিখও ছিলেন পররাজ্য লোভী। তিনি পোল্যান্ডের প্রথম বিভাজন, অস্ট্রীয় উত্তরাধিকার যুদ্ধ ও সাত বছরব্যাপী যুদ্ধে অংশ নেন এবং প্রুশিয়ার রাজ্যসীমা সম্প্রসারিত করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশ্বে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। দ্বিতীয় ফ্রেডারিখ কোন ভাষা কবিতা লিখতেন

(ক) জার্মান (খ) ফরাসি

(গ) ইংরেজি (ঘ) লাতিন

২। ফ্রেডারিখের সৈন্যবাহিনীতে সৈন্য সংখ্যা কত ছিল?

(ক) এক লক্ষ (খ) এক লক্ষ পচিশ হাজার

(গ) এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার (ঘ) দুই লক্ষ

৩। ফ্রেডারিখ কোন সম্প্রদায়ের মানুষকে কতগুলো নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন?

(ক) ইহুদী (খ) মুসলমান

(গ) প্রোটেষ্টান্ট (ঘ) ক্যাথলিক

৪। কোন অঞ্চল দখলের মাধ্যমে ইউরোপে সাত বছরব্যাপী যুদ্ধের সূত্রপাত হয়

(ক) বাভারিয়া (খ) স্যাক্সমি

(গ) বেলজিয়াম (ঘ) নরওয়ে

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১। প্রশাসনিক ক্ষেত্র এবং শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্যে দ্বিতীয় ফ্রেডারিখ কি কি ব্যবস্থা নিয়ে ছিলেন?

২। ধর্ম, শিক্ষা ও বিচার বিভাগে প্রবর্তিত দ্বিতীয় ফ্রেডারিখের সংস্কারগুলি আলোচনা করুন।

৩। দ্বিতীয় ফ্রেডারিখের শাসনকালে প্রুশিয়ার রাজ্য বিস্তারের বর্ণনা দিন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

১(খ), ২(খ), ৩(ক), ৪(খ)

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. Robert Ergang, Europe from Renaissance to Waterloo

2. C. G.H. Hayes, A Political and Cultural History of Europe

3. Pierre, Gaxotte, Frederick the Great.

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। মহামতি ফ্রেডারিখের বাল্যকালের বিবরণ দিন।

২। অস্ট্রিয়ার উত্তারাধিকার যুদ্ধে মহামতি ফ্রেডারিখ কি ভূমিকা পালন করেন?

৩। মহামতি ফ্রেডারিখের সার্বিক মূল্যায়ন করুন।

পাঠ - ৩

দ্বিতীয় যোসেফ

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- দ্বিতীয় যোসেফের ক্ষমতা লাভ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- দ্বিতীয় যোসেফের সংস্কারগুলো আলোচনা করতে পারবেন।

মহামতি ফ্রেডারিক ছিলেন ইউরোপের প্রথম প্রজাহিতৈষী বা জ্ঞানদীপ্ত শাসক। কিন্তু প্রকৃত বিচারে অস্ট্রিয়ার দ্বিতীয় যোসেফ ছিলেন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানদীপ্ত শাসক। তিনি জনকল্যাণে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন এবং তাঁর দশ বছরের শাসন আমলে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার প্রবর্তন করেন। এসব সংস্কার ব্যর্থ হয়, কিন্তু সংস্কার প্রবর্তনে তাঁর আন্তরিকতার অভাব ছিল না। পরিস্থিতি বিরূপ হওয়ায় তাঁর সংস্কার কর্মসূচি ব্যর্থ হয়।

ক্ষমতা লাভ

১৭৬৫ সালে অস্ট্রিয়ার প্রথম ফ্রান্সিস মৃত্যুবরণ করেন এবং তৎপুত্র দ্বিতীয় যোসেফ পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের (Holy Roman Empire) সম্রাট নিযুক্ত হন। একই সঙ্গে তিনি তাঁর মাতা মারিয়া থেরেসার সঙ্গে অস্ট্রিয়ার যৌথ শাসক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। সম্রাট হিসেবে তাঁর ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত সীমিত। দ্বিতীয়ত, তিনি অস্ট্রিয়ার যৌথ শাসকের মর্যাদা পেলেও প্রকৃত ক্ষমতা থেকে যায় তার মাতা মেরিয়া থেরেসার হাতে। কিন্তু তাঁর মাতার ধ্যান-ধারণা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ১৭৮০ সালে মারিয়া থেরেসার মৃত্যুর পর সমগ্র শাসন ক্ষমতা তাঁর হাতে আসে। অতপর তিনি সংস্কার প্রবর্তনের কাজে হাত দেন। তিনি ঘোষণা করেন 'দর্শন হবে আমার রাজ্যের প্রকৃত আইনকর্তা। পরবর্তী দশ বছরে তিনি এগার হাজার নতুন আইন জারি করেন। এতে তাঁর সংস্কার কর্মসূচির ব্যাপকতা প্রমাণিত হয়।

আর্থ-সামাজিক সংস্কার

আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে যোসেফের সংস্কারগুলো প্রবর্তিত হয়েছিল জনগণের জন্যে। সমান অধিকারের নিশ্চয়তা এবং সুখ-শান্তি বিধানের লক্ষ্যে তিনি নতুন ফৌজদারী আইন জারি করেন। এর ফলে মৃত্যুদন্ড নিষিদ্ধ এবং তদন্তকার্যে নির্যাতনের অবসান করা হয়। তিনি বলেন 'মৃত্যুদন্ড দীর্ঘস্থায়ী কঠোর শাস্তির ন্যায় ফলপ্রসূ হয় না। কেননা মৃত্যুদন্ড নিমিষেই কার্যকর করা হয় এবং মানুষ সহজেই এর কথা ভুলে যায়। অপরপক্ষে অন্যরকম শাস্তির কথা মানুষ দীর্ঘদিন মনে রাখে।স্ব সকল অপরাধীকে (কৃষক বা সামন্তপ্রভু) আইনের দৃষ্টিতে সমান অধিকার দেওয়া হয় এবং সকলের জন্যে একই প্রকার শাস্তির বিধান করা হয়। তিনি বলেন, 'আইনের দৃষ্টিতে সবাইকে সমান অধিকার দান আমার কর্তব্য। তাঁর শাসন আমলে খ্রিস্টান এবং অখ্রিস্টানদের বিয়ে, ডাকিনী বিদ্যা (Whitchcraft) ও স্ব-ধর্ম ত্যাগ অপরাধ বলে গণ্য হবে না বলেও ঘোষণা করা হয়। আর্থ-

সামাজিক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় যোসেফের সবচেয়ে বড় অবদান ছিল ভূমিদাস প্রথার অবসান। ১৭৮১ সালে রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার এক বছর পর তিনি এ সংস্কার প্রবর্তন করেন, ফলে ভূমিদাসগণ জমির মালিক হওয়ার, ইচ্ছামত বিয়ে করার এবং বসতি স্থাপনের অধিকার পায়। তাদেরকে সামন্তপ্রভুর সকল নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

ধর্ম বিষয়ক সংস্কার

দ্বিতীয় যোসেফের অন্য একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে প্রোটেস্টান্ট ও গ্রিক অর্থোডক্স গির্জার অনুসারীগণকে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম ছিল অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রীয় ধর্ম। তিনি বলেন, 'কুসংস্কার ও গোড়ামীর অবশ্যই অবসান হতে হবে এবং প্রত্যেক প্রজাকে তাঁর অধিকার দিতে হবে। স্ব ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্পর্কিত এ ঘোষণাটিও দেয়া হয় রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতা লাভের পর। অনুরূপভাবে ইহুদীদের উপর থেকেও সকল বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। তাদের উপর ইতিপূর্বে ধার্য করা করের অবসান করা হয়, তাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য করার ও কলকারখানা স্থাপনের অধিকার এবং সন্তানদের যেকোনো স্কুলে ভর্তি করানোর সুযোগ দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রজার ন্যায় ইহুদীদের জন্যে সেনাবাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক করা হয়। কিন্তু গোঁড়া ইহুদীদের অনেকেই তাঁর শেষোক্ত ঘোষণাটির বিরোধিতা করে। কেননা তাদের আশংকা হয় যে একই স্কুলে পড়াশুনা বা সেনাবাহিনীতে যোগদান করলে তাদের স্বাতন্ত্র্য ক্ষুন্ন হবে।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে দ্বিতীয় যোসেফ অন্যান্য কয়েকটি পরিবর্তন সাধন করেন এবং এগুলোর লক্ষ্য ছিল রোমান ক্যাথলিক গির্জাকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনয়ন করা। এজন্যে তিনি ঘোষণা করেন যে, তার অনুমোদন ব্যতীত পোপের কোনো ঘোষণা (Bull) বা বিধান অস্ট্রিয়ায় কার্যকর হবে না। এছাড়া নিয়ম করা হয় যে, সকল বিশপকে নিজ নিজ পদে যোগদানের সময় এমর্মে শপথ নিতে হবে যে, তাঁরা অস্ট্রীয় সরকারের প্রতি অনুগত থাকবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর গির্জার নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। যোসেফ দেশে আশ্রম ও সন্ন্যাসীর সংখ্যা কমিয়ে দেন এবং বিলুপ্ত আশ্রমের জমি থেকে প্রাপ্ত আয় বিদ্যালয়, হাসপাতাল এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্যে ব্যয় করেন। গির্জাকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আয়নের ফলে পোপ স্বভাবতই অসন্তুষ্ট হন। তার ক্ষমতা পুনর্বহালের জন্যে নিজে ভিয়েনায় আসেন। কিন্তু তাঁর চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নি, যোসেফ তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। এ প্রচেষ্টায় তিনি অবশ্যই প্রজাদের সমর্থন পেয়েছিলেন।

প্রশাসনিক সংস্কার

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যোসেফের সংস্কারের প্রধান লক্ষ্য ছিল রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার শাসনকে কেন্দ্রীভূত করা। এ উদ্দেশ্যে তিনি পুরাতন সামন্তবাদী শাসন ব্যবস্থার অবসান করেন এবং সার্কেল নামক এক নতুন প্রশাসনিক ইউনিট গড়ে তোলেন। প্রত্যেক সার্কেলের প্রশাসনিক দায়িত্ব দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়োজিত একজন গভর্নরের উপর। দ্বিতীয় যোসেফ ঘোষণা করেন যে, অতপর জার্মান ভাষা হবে সরকারি ভাষা। এছাড়া সকল বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলকভাবে জার্মান ভাষা শিক্ষা দেওয়া হতো এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ধর্মতত্ত্ব ব্যতীত অন্যান্য বিষয় জার্মান ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখের প্রয়োজন যে, অস্টীয় সাম্রাজ্যে জার্মানভাষী জনগোষ্ঠী ছাড়াও অন্যান্য জাতির মানুষ বসবাস করতো। এরা ছিল হাঙ্গেরি, চেকস্লাভাকিয়া, পোল্যান্ড ও ক্রোয়েশিয়ার অধিবাসী।

বেলজিয়ামের সংস্কার

বেলজিয়াম বা অস্ট্রিয়ান নেদারল্যান্ডে যোসেফ অস্ট্রিয়ার ন্যায় অনুরূপ সংস্কার প্রবর্তন করেন। মঠের সংখ্যা কমানো হয়, ধর্মীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় এবং প্রশাসনকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। অথচ বেলজিয়ামবাসীরা ছিল দীর্ঘদিন যাবত স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে আসছিল এবং তারা ছিল সামন্ত প্রভুদের শাসনে অভ্যস্ত। অতএব তারা অসন্তুষ্ট হয় এবং শেষ পর্যন্ত এ অসন্তোষ বিদ্রোহের রূপ ধারণ করে। হাঙ্গেরিতেও অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়। জার্মান ভাষাকে সরকারি ভাষার মর্যাদা দান, দেশটিকে অস্ট্রিয়ার একটি প্রদেশে পরিণত করার প্রয়াস, ভূমিদাস প্রথার অবসান হাঙ্গেরির মানুষ ভালো চোখে দেখে নি। সামন্ত প্রভুরা তাদের সুযোগ-সুবিধা অটুট রাখার জন্যে ভূমিদাস প্রথা রহিতকরণের আইন বাস্তবায়িত করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং যে কৃষক সমাজের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে যোসেফ এ সংস্কার প্রবর্তন করেন তাদেরকে বিদ্রোহী হতে প্ররোচিত করে। এ বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত এমনরূপ ধারণ করে যে, যোসেফ তাঁর আদেশ বাতিল করতে বাধ্য হন।

দ্বিতীয় যোসেফের মৃত্যু

তাঁর সংস্কারগুলো ব্যর্থ হতে যাচ্ছে এ উপলব্ধি তাঁকে দারুণভাবে ব্যথিত করে এবং যোসেফ মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন। তিনি ১৭৯০ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর সমাধি লিপি কেমন হবে তা নির্ধারণ করেন। এতে বলা হয় 'এখানে শায়িত আছেন একজন রাজকুমার যার উদ্দেশ্য ছিল মহৎ, কিন্তু তার সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।স্ব কিন্তু প্রকৃত বিচারে তাঁর কিছু কিছু সংস্কার প্রয়াস ফলপ্রসূ হয়েছিল। তিনি প্রজাদেরকে ধর্মীয় স্বাধীনতা দেন এবং দক্ষ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ভূমিদাস প্রথার অবসান করে তিনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তা পরবর্তীকালে ফ্রান্সের বিপ্লবী সরকার অনুসরণ করে এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের মানুষকে অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে।

যোসেফের ব্যর্থতার কারণ

একথা অনস্বীকার্য যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার প্রবর্তনের পেছনে দ্বিতীয় যোসেফের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রজাসাধারণের মঙ্গল বিধান করা। অর্থাৎ যোসেফের আন্তরিকতা সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। জনগণের মঙ্গলের জন্যে তিনি প্রতিদিন সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করতেন। তিনি যথার্থই বলেন, 'দেশের এবং জনগণের মঙ্গলের জন্যে আমি আমার মানসিক ও শারীরিক সর্বশক্তি দিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা থেকে কখনও বিরত হব না।স্ব কিন্তু তাঁর ধৈর্য ও বাস্তব জ্ঞানের অভাব ছিল। তাঁর সংস্কারগুলো জনগণের জন্যে মঙ্গলজনক হবে এ বিশ্বাসে তিনি তাদের দীর্ঘদিনের লালিত পালিত ধ্যান-ধারণাকে গুরুত্ব না দিয়ে এগুলোকে কার্যকর করতে সচেষ্ট হন। তিনি অনুধাবন করতে পারেননি যে তাঁকে সাবধান হতে হবে এবং ধৈর্য ধারণ করতে হবে।

সারসংক্ষেপ

দ্বিতীয় যোসেফ অস্ট্রিয়ার সমগ্র শাসন ক্ষমতা লাভ করেন ১৭৮০ সালে অর্থাৎ তাঁর মাতা মারিয়া থেরেসার মৃত্যুর পরে। তিনি ছিলেন প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী শাসকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। তিনি অস্ট্রিয়ার আর্থ-সামাজিক, প্রশাসনিক এবং ধর্মীয় জীবনে ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন। মৃত্যু দন্ডের অবসান, ভূমিদাস প্রথার অবসান, ধর্মীয় ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা, আইনের চোখে সমান অধিকার ঘোষণা প্রভৃতি ছিল তাঁর সংস্কারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। প্রজাদের মঙ্গল সাধনই ছিল তাঁর সংস্কারের পেছনে মূল উদ্দেশ্য। প্রকৃতপক্ষে প্রজাদের মংগলের জন্যে তিনি কঠোর পরিশ্রম করতেন। কিন্তু আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় যোসেফের সংস্কার দীর্ঘস্থায়ী হতে ব্যর্থ হয়। তিনি ১৭৯০ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশ্বে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মারিয়া থেরেসা কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?

(ক) ১৭৮০ সালে (খ) ১৭৮১ সালে

(গ) ১৭৮৩ সালে (ঘ) ১৭৮৯ সালে

২। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় যোসেফের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংস্কার কি?

(ক) ভূমিদাস প্রথার অবসান (খ) আইনের চোখে সবাইর সমান অধিকার ঘোষণা

(গ) মৃত্যুদন্ড নিষিদ্ধকরণ (ঘ) এদের কোনটিই নয়।

৩। কোন ভাষাকে অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়?

(ক) বেলজিয়ান ভাষা (খ) ফরাসি ভাষা

(গ) জার্মান ভাষা (ঘ) লাতিন ভাষা।

৪। যোসেফ কতটি নতুন আইন প্রণয়ণ করেন?

(ক) ১০ হাজার (খ) ১১ হাজার

(গ) ১২ হাজার (ঘ) ১৩ হাজার

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১। দ্বিতীয় যোসেফ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে কি কি সংস্কার প্রবর্তণ করেন?

২। দ্বিতীয় জোসেফের ধর্ম বিষয়ক ও প্রশাসনিক সংস্কার আলোচনা করুন।

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। দ্বিতীয় যোসেফ বেলজিয়ামে কি কি সংস্কার প্রবর্তন করেণ?

২। দ্বিতীয় যোসেফের ব্যর্থতার কারণগুলি আলোচনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তরঃ

১(ক), ২(ক), ৩(গ), ৪(খ)

সহায়ক গ্রন্থ

1. Robert Ergang, Europe From Renaissance to Waterloo

2. Geoffrey Bruun, The Enlighten Despots

পাঠ - ৪

পোল্যান্ডের বিভাজন

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- পোল্যান্ডের দুর্বলতার কারণ আলোচনা করতে পারবেন;
- পোল্যান্ডের বিভাজন বর্ণনা দিতে পারবেন।

আঠার শতকের শুরুতে পোল্যান্ড ছিল আয়তনের দিক থেকে ইউরোপের তৃতীয় বৃহত্তম এবং জনসংখ্যার দিক থেকে চতুর্থ বৃহত্তম দেশ। দেশটির আয়তন এবং জনসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৮০০০০ বর্গ মাইল এবং ১ কোটি ২০ লক্ষ জন। এদেশের বিস্তার ছিল বাল্টিক থেকে কৃষ্ণ সাগর এবং জার্মানির পূর্ব সীমানা থেকে রাশিয়ার পশ্চিম সীমানা পর্যন্ত। পোল্যান্ডের সর্বশেষ খ্যাতিমান রাজা ছিলেন জনসবিস্কি। তাঁর মৃত্যুর পর পোল্যান্ডের পতন শুরু হয় এবং পরপর তিনবার ব্যবচ্ছেদের ফলে দেশটি ইউরোপের মানচিত্র থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পোল্যান্ডের প্রথম বিভাজন ঘটেছিল ১৭৭২ সালে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাজন ঘটেছিল যথাক্রমে ১৭৯২ এবং ১৭৯৫ সালে।

পোল্যান্ডের দুর্বলতার কারণ

বিভিন্ন কারণে আঠার শতকে পোল্যান্ডের পতন ঘটেছিল। এগুলো ছিল রাজতন্ত্রের দুর্বলতা, সামন্তপ্রভুদের শ্রেণী দুর্বলতা, ধর্মক্ষেত্রে বিরোধ, জাতিগত সমস্যা, শক্তিশালী সেনাবাহিনী এবং প্রাকৃতিক সীমানার অভাব। এসবের মধ্যে রাজনৈতিক কারণটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কেননা সরকার শক্তিশালী হলে অন্যান্য সমস্যার সমাধান সম্ভব হতে পারতো।

সরকার ব্যবস্থা

সরকার ব্যবস্থার দিক থেকে পোল্যান্ডের অবস্থা ছিল ইউরোপীয় অন্যান্য দেশ থেকে ভিন্ন। কেননা নিয়ম ছিল যে, দেশের রাজা সামন্তপ্রভুদের নিয়ে গঠিত পার্লামেন্ট বা ডায়েট কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। ১৫৭২ সালের আগে নিয়ম ছিল যে রাজার ছেলেকেই তার উত্তরাধিকার হিসেবে নির্বাচিত করতে হবে। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে রাজা কিছু স্বাধীন ক্ষমতা ভোগ করতেন। কিন্তু ১৫৭২ সালে এ দুটো নিয়ম পরিবর্তিত হয়। অতপর নির্বাচনকালে প্রত্যেক রাজাকে কতোগুলো শর্ত মেনে চলার অঙ্গীকার করতে হতো। এসব শর্তের মধ্যে দুটো ছিল প্রধান। প্রথমত, রাজা কোনো উত্তরাধিকারের নাম প্রস্তাব করতে পারবে না।

দ্বিতীয়ত, রাজা শুধু ডায়েট কর্তৃক অনুমোদিত ক্ষমতা ভোগ করবেন। এভাবে ইউরোপের অন্যন্য দেশের রাজা যখন সামন্তপ্রভুদের ক্ষমতা খর্ব করে শক্তিশালী হচ্ছিলেন এবং স্বেচ্ছাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পোল্যান্ডে তখন রাজা বেশি মাত্রায় সামন্তপ্রভুদের নিয়ন্ত্রণ মেনে নিচ্ছিলেন।

আঠার শতকের শুরুতে রাজা যেসব বিষয়ে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন সেগুলোর মধ্যে ছিল বেসামরিক ও ধর্মীয় কর্মকর্তা নিয়োগ। কিন্তু নিয়ম ছিল যে, এসব কর্মকর্তা আমরণ ক্ষমতায় থাকতে পারবেন এবং তাদেরকে দোষী প্রমাণ না করে বরখাস্ত করা যাবে না। ফলে রাজা এসব কর্মকর্তার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারতেন না।

সামন্তপ্রভুদের সুযোগ-সুবিধা

এভাবে রাজা যখন ক্ষমতা হারাচ্ছিলেন সামন্তগোষ্ঠী তখন অধিকতর ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিলো। সামন্তপ্রভুরা ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিলো। সামন্তপ্রভুরা ছিল দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র শতকরা আট ভাগ, কিন্তু তারা শাসন ক্ষমতা থেকে অন্যান্য শ্রেণীর মানুষকে বঞ্চিত করেছিলো। কেননা শুধু তাদের প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে দেশের ডায়েট বা পার্লামেন্ট গঠিত ছিল, অথচ ডায়েটের হাতে আইন প্রণয়ন, কর ধার্যকরণ, যুদ্ধ ঘোষণা, চুক্তি স্বাক্ষর প্রভৃতি ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল। প্রশাসনিক উচ্চ পদে নিয়োগ এবং শহরের বাইরে শুধু তারাই জমি ক্রয়ের সুযোগ পেতো। তাদের একমাত্র দায়িত্ব ছিল যুদ্ধের সময় বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক বাহিনীতে যোগদান করা। এছাড়া সামন্তপ্রভুরা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারতো না।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুর্বলতা

দেশে শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল না। শহরবাসীরা ছিল মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৪ ভাগ। কিন্তু এদের অধিকাংশই ছিল ইহুদী এবং বিদেশী। মধ্যযুগে পোল্যান্ডের অনেক শহর সমৃদ্ধি লাভ করেছিল, কেননা দেশের ভেতর দিয়ে বিভিন্ন ধরনের পণ্যের আদান-প্রদান হতো। পরবর্তীকালে কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভূমধ্যসাগরের পরিবর্তে আটলান্টিক মহাসাগরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় পোল্যান্ডের ভেতর দিয়ে বাণিজ্যের পরিমাণ কমে যায়। এতে পোল্যান্ডের শহরগুলোর পতন শুরু হয়। এছাড়া ডায়েট এমন সব আইন পাশ করে, যা ছিল ব্যবসায়ী শ্রেণীর স্বার্থের পরিপন্থী। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, ১৫৬৫ সালে ডায়েট দেশী বণিকদের জন্যে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৬৪৩ সালে ডায়েট ব্যবসায়ীদের জন্যে লাভের সর্বোচ্চ হার শতকরা সাতভাগে নির্ধারণ করে দেয়। এভাবে অন্যান্য দেশের সরকার যেখানে বণিকশ্রেণীর বিকাশের জন্যে উৎসাহ দিচ্ছিল পোল্যান্ডের সরকার তখন এ শ্রেণীর বিকাশের পথকে রুদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়। এছাড়া আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রশাসনিক পদগুলো সামন্তপ্রভুদের জন্যে নিষিদ্ধ ছিল। এতোসব বাধার কারণে দেশে শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠে নি।

কৃষকদের শোচনীয় অবস্থা

দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা সত্তর ভাগ ছিল কৃষক, আর এদের মধ্যে ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ ছিল ভূমিদাস। এদের অবস্থা ইউরোপের অপর যে কোনো দেশের ভূমিদাসদের অবস্থার চেয়ে শোচনীয় ছিল। ভূমিদাসদেরকে সপ্তাহের পাঁচ বা ছয় দিন সামন্তদের খামারে বেগার খাটতে হতো, সামন্তদের আদালতে প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করার কোন অধিকার তাদের ছিল না, কোন ভূমিদাস সামন্তপ্রভুর হাতে নিহত হলে অপরাধীর উপর শুধু কিছু জরিমানা ধার্য করা হতো। অনেক ক্ষেত্রে তারা কোন্ ধর্ম অনুসরণ করবে তা সামন্তপ্রভু নির্ধারণ করতো। এসব কারণে আঠার শতকে পোল্যান্ডের কৃষক শ্রেণীর অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে।

ধর্ম ও জাতিগত বিরোধ

পোল্যান্ডের জনগোষ্ঠী ছিল বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের। জনসংখ্যার মাত্র অর্ধেক ছিল পোলিশ, লিথুয়ানিয়ায় ছিল রাশিয়ান ও লিথুয়ানিয়ান, ইউক্রেনে ছিল রাশিয়ান, পশ্চিমে প্রুশিয়ায় ছিল জার্মান। এছাড়া দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল পাঁচ লক্ষ ইহুদী। এসব জাতির মানুষের মধ্যে ঐক্য ছিল না, ছিল বিরোধ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ধর্মীয় বিরোধ। রোমান ক্যাথলিক ধর্ম ছিল রাষ্ট্রীয় ধর্ম, কিন্তু পোলিশ ব্যতীত অন্যান্য গোষ্ঠীর ধর্ম ছিল ভিন্ন। একদল ছিল ইহুদী, জার্মানরা ছিল প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মাবলম্বী এবং রাশিয়ানরা ছিল গ্রিক অর্থোডক্স গির্জার অনুসারী। শেষোক্ত দুটি গোষ্ঠী 'dissenters' নামে পরিচিত ছিল। ১৭৩৩ ও ১৭৩৬ সালের আইনে এদেরকে রাজনৈতিক এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। ১৭১৭ সালের একটি আইন বলে তাদের জন্যে গির্জা নির্মাণ নিষিদ্ধ করা হয়। ধর্মীয় ক্ষেত্রে সহনশীলতার অভাব স্বভাবতই তাদেরকে ক্ষুব্ধ করে এবং এর ফলে জার্মানি ও রাশিয়া পোল্যান্ডের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পায়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে গ্রিক অর্থোডক্স গির্জার অনুসারীদের আনুগত্য ছিল রাশিয়ার প্রতি এবং জার্মানদের আনুগত্য ছিল প্রুশিয়ার প্রতি। এভাবে শুধু রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণেই পোল্যান্ড দুর্বল রাষ্ট্রে পরিণত হয় নি, এর পেছনে জাতিগত এবং ধর্মীয় কারণও ছিল।

প্রাকৃতিক সীমানার অভাব

প্রাকৃতিক সীমানার অভাব পোল্যান্ডের পতনের আর একটি কারণ। শুধু দক্ষিণ দিক ব্যতীত অন্যান্য দিক থেকে পোল্যান্ড ছিল উন্মুক্ত, অর্থাৎ পোল্যান্ডের সীমারেখা নদী বা পাহাড়, পর্বত দিয়ে চিহ্নিত ছিল না। এ দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার একমাত্র উপায় ছিল শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন, কিন্তু এদিক থেকেও পোল্যান্ড ছিল দুর্বল। সেনাবাহিনী শক্তিশালী হলে রাজা এর সাহায্যে শক্তিশালী হওয়ার চেষ্টা করতে পারেন এ আশংকায় ডায়েট ১৭১৭ সালে পোল্যান্ডের সেনাবাহিনীকে নির্ধারিত করে চব্বিশ হাজারে, কিন্তু সৈন্যসংখ্যা কখনও বারো হাজারের বেশি হয় নি। এভাবে পোল্যান্ড যখন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে দুর্বল হচ্ছিল পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলো (রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও প্রুশিয়া) তখন ক্রমশ শক্তিশালী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠেছিল। পোল্যান্ড বা এর অংশ বিশেষ দখল করার লোভে এসব রাষ্ট্র কোনোদিন চায় নি যে পোল্যান্ড শক্তিশালী হয়ে উঠুক, তাদের লক্ষ্য ছিল পোল্যান্ডকে দুর্বল রাখা এবং এ দুর্বলতার সুযোগে দেশটিকে গ্রাস করা। পরপর তিনবার বিভাজনের ফলে সত্যিই একদিন পোল্যান্ড ইউরোপের মানচিত্র থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

পোল্যান্ডের প্রথম বিভাজন

পোল্যান্ডের প্রথম বিভাজন ঘটে ১৭৭২ সালে। এ লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করে প্রুশিয়ার মহামতি ফ্রেডারিখ এবং রাশিয়ার দ্বিতীয় ক্যাথারিন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা উভয়েই ছিলেন আঠার শতকের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের চিন্তা-চেতনায় অনুপ্রাণিত অর্থাৎ 'জ্ঞানদীপ্তিম্ব। কিন্তু অস্ট্রিয়া তাঁদের পরিকল্পনায় বিরোধিতা করতে পারে এমন আশংকায় ফ্রেডারিখ ও ক্যাথারিন অস্ট্রিয়ার মারিয়া থেরেসাকে পোল্যান্ডের এক অংশ দেওয়ার প্রস্তাব করেন। তিনি এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। পোল্যান্ডের অবস্থান প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর নিরাপত্তার জন্যে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে-এ অজুহাতে তিনটি রাষ্ট্রের শাসক ১৭৭২ সালে দেশটির প্রথম ব্যবচ্ছেদ ঘটান। চুক্তির শর্তানুসারে প্রুশিয়া লাভ

করে ডানজিগ ও থর্ন ব্যতীত পশ্চিম প্রুশিয়ার সবটা, অস্ট্রিয়া লাভ করে গ্যালিচিয়া ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এবং রাশিয়া অধিকার করে শ্বেত রাশিয়া (White Russia) ও অন্যান্য অঞ্চল।

দ্বিতীয় বিভাজন

প্রথম ব্যবচ্ছেদের পরবর্তী বিশ বছরে পোল্যান্ডকে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে কতগুলো ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এগুলো ছিল লিভারাস ভেটোর অবসান, সামন্তপ্রভুদের ক্ষমতা খর্ব, বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, কৃষকদের অবস্থার উন্নয়ন, ব্যবসায়ীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও তাদেরকে ডায়েটের সদস্যপদ দান প্রভৃতি। কিন্তু এসব ব্যবস্থা স্বভাবতই রাশিয়া এবং প্রুশিয়ার পছন্দ হয় নি। অতএব ১৭৯২ সালে রাশিয়ার এবং পরের বছর প্রুশিয়ার সেনাবাহিনী পোল্যান্ড আক্রমণ করে। পোল্যান্ড পরাজিত হয়। ফলে রাশিয়া ত্রিশ লক্ষ এবং প্রুশিয়া দশ লক্ষ লোক অধ্যুষিত পোল্যান্ডের একটি বিরাট অঞ্চল দখল করে নেয়। এবং পোল্যান্ড সংস্কার কর্মসূচি বাতিল করতে বাধ্য হয়। অস্ট্রিয়া পোল্যান্ডের দ্বিতীয় বিভাজনে অংশগ্রহণ করে নি।

তৃতীয় বিভাজন

অতঃপর সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশংকা দূর করার জন্যে পোল্যান্ডবাসী সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করে। এর নেতৃত্ব দেয় থেডিয়াস কস্কিউসকো (Thaddeus Kosciusko)। তিনি আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে মার্কিনীদের পক্ষে অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রথমবারের মতো পোল্যান্ডের কৃষক শ্রেণী অস্ত্রহাতে নেয়ার সুযোগ পায় এবং তারাও প্রতিরোধ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। প্রথমদিকে পোলিশ বাহিনী জয়লাভ করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রুশিয়া, রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মিলিত বাহিনীর কাছে তারা পরাজিত হয়। পোল্যান্ডের রাজা স্টেনিসলস পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং দেশটির বাকি অংশ এ তিনটি রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। অত:পর পোল্যান্ড নামক আর কোনো রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ইউরোপের মানচিত্রে থাকলো না।

সারসংক্ষেপ

পোল্যান্ডের বিভাজন আঠার শতকের ইউরোপের ইতিহাসে একটি অন্যতম দুঃখজনক ঘটনা। পর পর তিনবার (১৭৭২, ১৭৯২ ও ১৭৯৫ সালে) ব্যবচ্ছেদের ফলে পোল্যান্ড ইউরোপের মানচিত্র থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পোল্যন্ডের প্রথম ব্যবচ্ছেদে অংশ নেয় প্রুশিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেডারিখ, রাশিয়ার দ্বিতীয় ক্যাথারিন এবং অস্ট্রিয়ার মারিয়া থেরেসা। অস্ট্রিয়া পোল্যান্ডের দ্বিতীয় বিভাজনে অংশ নেয় নি। তৃতীয় বিভাজনে অস্ট্রিয়া প্রুশিয়া ও রাশিয়ার সংগে আবার অংশ নেয়। পোল্যান্ডের বিভাজন সম্ভব হয়েছিল প্রধানত দুটো কারণে। এক দিকে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে পোল্যান্ডের দুর্বলতা অপর দিকে প্রুশিয়া, রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার শাসকদের অন্যের রাজ্য গ্রাসের লোভ। অভ্যন্তরীণক্ষেত্রে পোল্যান্ড দুর্বল হয়ে পড়েছিল এ কারণে যে, রাজা ছিলেন সামন্ত প্রভুদের হাতের ক্রীড়নক মাত্র, দেশে শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী বা সৈন্যবাহিনী ছিল না, কৃষকদের অবস্থা ছিল শোচনীয় এবং ধর্ম ও জাতিগত বিরোধ ছিল তীব্র। পোল্যান্ডকে এর দুঃখজনক পরিণতি বহন করতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশ্বে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সামন্ত প্রভুরা পোল্যান্ডের মোট জনসংখ্যার কত ভাগ ছিল?

(ক) ১২ ভাগ (খ) ১১ ভাগ

(গ) ১০ ভাগ (ঘ) ৮ ভাগ

২। পোল্যান্ডের শহরবাসীদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ কোন সম্প্রদায়ভূক্ত ছিল?

(ক) ক্যাথলিক (খ) প্রটেষ্টান্ট

(গ) ইহুদী (ঘ) এদের কোনটিই নয়।

৩। ডায়েট ব্যবসায়ীদের সর্বোচ্চ মুনাফার হার নির্ধারণ করে কত সালে?

(ক) ১৬৪০ সালে (খ) ১৬৪১ সালে

(গ) ১৬৪২ সালে (ঘ) ১৬৪৩ সালে

৪। পোল্যান্ডের কৃষকদের মধ্যে কতভাগে ভূমিদাস ছিল?

(ক) ছয়ভাগের পাঁচ ভাগ (খ) সাত ভাগের ছয় ভাগ

(গ) পাঁচ ভাগের তিন ভাগ (ঘ) তিন ভাগের এক ভাগ

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। পোল্যান্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা আলোচনা করুন

২। পোল্যান্ডে ধর্ম ও জাতিগত বিরোধের বর্ণনা দিন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে পোল্যান্ডের দুর্বলতার কারণগুলি আলোচনা করুন।

২। পোল্যান্ডের তিনটি বিভাজনের বিবরণ দিন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর

১। (ঘ), ২। (গ), ৩। (খ), ৪। (ক)

সহায়ক গ্রন্থাবলী

1. Robert Ergang, Europe From Renaissance to Waterloo
2. O. Halecki, History of Poland